তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্ররূপক-সাংকেতিক নাটকে চিত্রকল্প-প্রথম পর্যায় : *শারদোৎসব, ফাল্গুনী*

শারদোৎসব

শারদোৎসব নাটকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের উৎসবমুখর আনন্দের ছবি ফুটে উঠেছে। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত এই নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথের ঋতু-উৎসবের প্রথম অর্ঘ্য এবং রূপক-সাংকেতিক পর্যায়ের নাটকের প্রথম প্রয়াস হিসেবে গণ্য করা হয়। এই নাটকে ধরা আছে অনির্বচনীয় এক সৌন্দর্যচেতনা। নাট্যকারের নিজের কথায় শারদোৎসব নাটকের মর্মকথার সন্ধান মেলে—

> "'শারদোৎসব' থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রতেক্যের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথি। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল-উপনন্দ-সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্য নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তার সত্যকার সাথি মিলেছে, কেননা ওই ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ; ওই ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে; সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত; অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয়, কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধের শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে

বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এইজন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে; ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই-ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।"[১]

শারদোৎসবের তত্ত্বটির একটা পরোক্ষ আভাস এই উক্তিতে ধরা দিয়েছে। নাটকটির পরবর্তী রূপান্তর 'ঋণশোধ'-এ অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের বালকদের কথা মাথায় রেখে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি রচনা করেন। 'শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটা'র বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"সমস্ত নাটককে ব্যাপ্ত করিয়া যে ভাবটা আছে, সেটা আমাদের আশ্রমের বালকদের পক্ষে সহজ। বিশেষ বিশেষ ফুলে-ফলে-হাওয়ায়-আলোকে-আকাশে পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব চলিতেছে। সেই উৎসব মানুষ যদি অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ না করে, তবে সে পার্থিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ এবং মহৎ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের নানা কাজে নানা খেলায় মিলনের নানা উপলক্ষ্য আছে। মিলন ঠিকমতো ঘটিলেই, অর্থাৎ তাহা কেবলমাত্র হাটের মেলা বাটের মেলা না হইলে, সেই মিলন নিজেকে কোনো না কোনো উৎসব-আকারে প্রকাশ করে, মিলন যেখানেই ঘটে, অর্থাৎ বহুর ভিতরকার মূল ঐক্যটি যেখানেই ধরা পড়ে, যাহারা বাহিরে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান তাহাদের অন্তরের নিত্য সম্বন্ধ যেখানেই উপলব্ধ হয়, সেখানেই সৃষ্টির অহেতুক অনির্বচনীয় লীলা প্রকাশ পায়। বহুর বিচিত্র ঐক্যসম্বন্ধই সৃষ্টি। মানুষ যেখানে বিচ্ছিন্ন সেখানে তাহার সৃজনকার্য দুর্বল। 'সভ্যতা' শব্দের অর্থই এই, মানুষের মিলনজাত একটি বৃহৎ জগৎ; এই জগতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বিধিব্যবস্থা, ধর্মকর্ম, শিল্প-সাহিত্য, আমোদ-আহ্লাদ সমস্তই একটি বিরাট সৃষ্টি, এই সৃজনের মূলশক্তি মানুষের সত্য সম্বন্ধ। মানুষ যেখানে বিরুদ্ধ, সেখানে তাহার সৃজনকার্য নিস্তেজ। সেখানে সে কেবল

কলে চালানো পুতুলের মতো চিরাভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করে চলে, আপন জ্ঞান-প্রাণ-প্রেমকে নব নব আকারে প্রকাশ করে না। মিলনের শক্তিই সৃজনের শক্তি।

মানুষ যদি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিত তবে লোকালয়ই মানুষের একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র হইত। কিন্তু মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে রসে জাগিয়া উঠিতেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলিতেছে, কিন্তু মানুষের প্রধান সৃজনের ক্ষেত্র তাহার চিত্তমহলে। এই মহলে যদি দ্বার খুলিয়া আমরা বিশ্বকে আহ্বান করিয়া না লই, বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণমিলন ঘটে না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের মিলনের অভাব আমাদের মানব-প্রকৃতির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড অভাব।

যে মানুষের মধ্যে সেই মিলন বাধা পায় নাই, সেই মানুষের জীবনের তারে তারে প্রকৃতির গান কেমন করিয়া বাজে, ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'Three Years She Grew' নামক কবিতায় অপূর্ব সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত অবাধ মিলনে 'ল্যুসি'র দেহমন কী অপরূপ সৌন্দর্যে গড়িয়া উঠিবে তাহারই বর্ণনা উপলক্ষ্যে কবি লিখিতেছেন,

'প্রকৃতির নির্বাক ও নিশ্চেতন পদার্থের যে নিরাময় শান্তি ও নিঃশব্দতা তাহাই এই বালিকার মধ্যে নিশ্বসিত হইবে। ভাসমান মেঘসকলের মহিমা তাহারই জন্য, এবং তাহারই জন্য উইলো-বৃক্ষের অবনম্রতা। ঝড়ের গতির মধ্যে যে একটি শ্রী তাহার কাছে প্রকাশিত, তাহারই নীরব আত্মীয়তা আপন অবাধভঙ্গীতে এই কুমারীর দেহখানি গড়িয়া তুলিবে। নিশীথরাত্রির তারাগুলি হইবে তাহার ভালবাসার ধন। আর, যে-সকল নিভৃত-নিলয়ে নির্ঝরিণীগুলি বাঁকে বাঁকে উচ্ছলিত হইয়া নাচিয়া চলে, সেইখানে কান পাতিয়া

থাকিতে থাকিতে কলধ্বনির মাধুর্যটি তাহার মুখশ্রীর উপরে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতে থাকিবে।'

পূর্বেই বলিয়াছি, ফুল-ফল-ফসলের মধ্যে প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য কেবলমাত্র একমহলা; মানুষ যদি তাহার দুই মহলেই আপন সঞ্চয়কে পূর্ণ না করে তবে সেটা তাহার পক্ষে বড়ো লাভ নহে। হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করিলে তবেই প্রকৃতির সহিত তাহার মিলন সার্থক হয়, সুতরাং সেই মিলনেই তাহার প্রাণমন বিশেষ শক্তি, বিশেষ পূর্ণতা লাভ করে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরও অনেক বড়ো হইয়া উঠে। তখন আমরা আকাশ-বাতাস, গাছপালা, পশুপাখী সকলের সঙ্গে মিলি-অর্থাৎ যে প্রকৃতির মধ্যে আমরা মানুষ তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ আমরা অন্তরের মধ্যে স্বীকার করি। সেই স্বীকার করা কখনোই নিষ্ফল নহে। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, সম্বন্ধেই সৃষ্টির প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে যখন কেবল আছি মাত্র তখন না থাকারই সামিল, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের প্রাণমনের সম্বন্ধ-অনুভবেই আমরা সৃজনক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করি; চিত্তের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে আপনার মধ্যে এই সৃজনশক্তিকে কাজ করিবার বাধা দেওয়া হয়।

তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারিদিক হইতে সাড়া দিতে থাকে, তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহবান করে; সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোনো গান না জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। 'শারদোৎসব' সেই ঋতু-উৎসবেরই একটি নাটকের পালা।"[২]

প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেকে প্রসারিত করার ব্যাকুলতা নাটকের এই পালাটির মধ্য দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছে। নাটকটি শিক্ষামূলক। রবীন্দ্রনাথের সব তত্ত্বনাটকই শিক্ষামূলক। 'শারদোৎসব' আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে মেলবন্ধনের শিক্ষা দিয়েছে। সেই শিক্ষা ঋণ-শোধের যা প্রকৃতির কাছ থেকে শিখে নিতে হয়—

> "শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসিয়া উপনন্দ তার প্রভুর ঋণ শোধ করিতেছে; রাজসন্ন্যাসী এই প্রেমঋণ পরিশোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখিতে পাইলেন। তাঁর তখনই মনে হইল, শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য। শরতে এই যে নদী ভরিয়া উঠিল কূলে কূলে, এই যে খেত ভরিয়া উঠিল শস্যের ভারে, ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই—প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেইটাকে বাহিরের নানা রূপে নানা রসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয়, সেখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয়; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য।
>
> দেবতা আপনাকেই কি মানুষের মধ্যে দেন নাই? সেই দানকে যখন অক্লান্ত তপস্যার অকৃপণ ত্যাগের দ্বারা মানুষ শোধ করিতে থাকে তখনই দেবতা তাহার মধ্য হইতে আপনার দান অর্থাৎ আপনাকে নূতন আকারে ফিরিয়া পান, আর তখনই কি তাহার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না? সেই প্রকাশ যতই বাধা কাটাইয়া উঠিতে থাকে ততই কি তাহা সুন্দর উজ্জ্বল হয় না? বাধা কোথায় কাটে না? যেখানে আলস্য, যেখানে বীর্যহীনতা, যেখানে আত্মাবমাননা। যেখানে মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্মে দেবতা হইয়া উঠিতে সর্বপ্রযত্নে প্রয়াস না পায় সেখানে নিজের মধ্যে সে দেবত্বের গুণ অস্বীকার করে। যেখানে ধনকে সে আঁকড়িয়া থাকে, স্বার্থকেই চরম আশ্রয় বলিয়া মনে করে, সেখানে দেবতার ঋণকে সে নিজের ভোগে লাগাইয়া একেবারে ফুঁকিয়া দিতে চায়- তাহাকে যে অমৃত দেওয়া হইয়াছিল, যে অমৃতের উপলব্ধিতে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অবজ্ঞা করিতে পারে, দুঃখকে গলার হার করিয়া লয়, জীবনের প্রকাশের

মধ্য দিয়া সেই অমৃতকে তখন সে শোধ করিয়া দেয় না। বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবপ্রকৃতিতে এই অমৃতের প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য : আনন্দ রূপমমৃতম।

রাজসন্ন্যাসী উপনন্দকে দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, এই ঋণশোধেই যথার্থ ছুটি, যথার্থ মুক্তি। নিজের মধ্যে অমৃতের প্রকাশ যতই সম্পূর্ণ হইতে থাকে ততই বন্ধন মোচন হয়; কর্মকে এড়াইয়া, তপস্যায় ফাঁকি দিয়া, পরিত্রাণ লাভ হয় না। তাই তিনি উপনন্দকে বলিয়াছেন, 'তুমি পঙক্তির পর পঙক্তি লিখছ আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ'।

এই লইয়া সন্ন্যাসীতে ঠাকুরদাদাতে যে কথাবার্তা হইয়াছে নীচে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

সন্ন্যাসী। আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন? ... আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে।... কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা। একদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন আর একদিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলছে। ... এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি সুন্দর হয়ে উঠছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানে ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী...

ঠাকুরদাদা। সেইখানেই যে এক পক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

সন্ন্যাসী। লক্ষ্মী যখন মানবের মর্তলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই তপস্বিনীরূপেই ভগবান মুগ্ধ। শত দুঃখের দলে তাঁর পদ্ম সংসারে ফুটেছে।

লক্ষ্মী সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী; গৌরী যেমন তপস্যা করিয়া শিবকে পাইয়াছিলেন, মর্তলোকে লক্ষ্মীও তেমনি দুঃখের সাধনার দ্বারাই ভগবানের সহিত মিলন লাভ করেন। যে মানুষ বা জাতির মধ্যে এই ত্যাগ নাই, তপস্যা নাই, দুঃখস্বীকারে জড়তা, সেখানে লক্ষ্মী নাই, সুতরাং সেখানে ভগবানের প্রেম আকৃষ্ট হয় না।

উপনন্দ তাহার প্রভুর নিকট হইতে প্রেম পাইয়াছিল, ত্যাগস্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বাহিয়া সে যতই সেই প্রেমদানের সমান ক্ষেত্রে উঠিতেছে ততই সে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে। দুঃখই তাহাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সহিত ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাহাই কুশ্রীতা।”[৩]

উপনন্দ তার প্রভুর ঋণশোধ করার জন্য দুঃখকে মেনে নিয়েছে। দুঃখের ভেতর দিয়েই সে পেয়েছে আনন্দকে। একা উপনন্দ ঋণশোধের কাজটি করছে তা কিন্তু নয়। প্রেম ভালোবাসা এবং প্রজাবাৎসল্যের ভেতর দিয়ে রাজসন্ন্যাসী বিজয়াদিত্য তাঁর মতো করে ঋণশোধ করেছেন। নিজেকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে বাৎসল্যের ভক্তিরস ঢেলে ঠাকুরদা সংসারের ঋণশোধ করেছেন। রাজা সোমপাল আর লক্ষেশ্বর অবশ্য ঋণশোধ করতে পারে নি। ঈর্ষা ও স্বার্থপরতার জন্য তারা উৎসবের আনন্দতরঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এ নাটকে দুঃখকে বড়ো মূল্য দেওয়া হয়েছে। দুঃখকে আনন্দেরই অঙ্গ বলে রবীন্দ্রনাথ মান্যতা দিয়েছেন। যেন ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যেও ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা উপনন্দ আনন্দলোকের আলোকে উপলব্ধি করতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সৌন্দর্য জিনিসটা অনন্ত অসীমের বার্তাবহ। প্রকৃতির সৌন্দর্য গৃহী মানুষকে সীমা থেকে অসীমালোকে পৌঁছে দিতে পারে। কবির গভীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও মানুষ ঋণশোধের আনন্দে ব্যাপৃত। এই ঋণশোধের মধ্যেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ ও মুক্তি সম্ভব। ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে মুক্ত করে অসীমের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করার একান্ত বাসনা রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত ‘বসুন্ধরা’ কবিতায় ধরা পড়েছে—

"আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চল-তলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো; বিদরিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া, আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে, উত্তরে দক্ষিণে,
পুরবে পশ্চিমে-শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবনরসে;"[৪]

'বসুন্ধরার' এই ভাবটি শারদোৎসবের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। শরৎপ্রভাতের সূর্যকিরণ মানুষের মনকে কীভাবে রাঙা করে তোলে তারই প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে এই নাটকে। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ সাধনের জন্য ঠাকুরদা, কবিশেখর, বিজয়াদিত্য প্রত্যেকেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ডাকে সাড়া দিয়ে শরতের আনন্দনির্ঝরে প্রবাহিত হয়েছেন। 'বনবাণী'-র ভূমিকাংশে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার এই শাশ্বত বন্ধনকে রবীন্দ্রনাথ "মহামুক্তি"[৫] বলে অভিহিত করেছেন—

"ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে

সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে শান্তম শিবম অদ্বৈতম। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন।"[৬]

শরৎ ছুটি বা অবকাশ যাপনের ঋতু। নাটকের মধ্যেও ছুটির বা মুক্তির অনুষঙ্গ প্রধান হয়ে উঠেছে—

"ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হচ্ছে—'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা'। ওর মধ্যে এক উপনন্দ কাজ করছে কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।"[৭]

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"নাটকে কাজের কথা নাই, আছে শুধু ছুটির খুশি-একটা খুশির ঝিলিক নাটকখানিকে দীপ্তিময় করিয়া রাখিয়াছে।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ ১৩২৯ সালে কলকাতায় অভিনীত শারদোৎসবের একটি নাটকীয় ভূমিকা লিখেছিলেন। সেই ভূমিকাটি তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে বলা হয়েছে যে—

"রাজা। আমাদের কবিশেখরের কথা বলছ? তা, তার উপরে তো ভার ছিল উৎসব উপলক্ষে একটা যাত্রার পালা তৈরি করবার জন্যে।

মন্ত্রী। আপনি তো তাঁকে জানেন; সুবিধা অসুবিধা, স্থান কাল পাত্র, এ-সবের দিকে তাঁর একেবারেই দৃষ্টি নেই। তিনি আপন খেয়ালমতোই চলেন।

রাজা। তা, হয়েছে কী? লোকটা পালিয়েছে নাকি?

মন্ত্রী। এক রকম পালানই বৈকি। সভাপণ্ডিত-মশায় ঠিক করে দিয়েছিলেন, এবারকার উৎসবের জন্যে শুম্ভনিশুম্ভ-বধের পালা তৈরি করে দিতে হবে। এ কথা হয়েছিল সেই মহাদ্বাদশীর দিনে। কাল শুনি কবি সে পালা তৈরিই করেন নি।

রাজা। কী সর্বনাশ! এ মানুষকে নিয়ে দেখছি আর চলে না। সখা, তুমি কেনারাম পাঁচালিওয়ালার উপর ভার দিলে না কেন, এখন উপায়?

মন্ত্রী। কবি বলেছেন, তিনি তাঁর মনের মতো ছোটো একটা পালা লিখেছেন।

রাজা। তাতে আছে কী?

মন্ত্রী। তা তো বলতে পারি নে। সংক্ষেপে যা বর্ণনা করলেন তাতে ভাবটা কিছুই বুঝতে পারলেম না। বললেন যে, সেটা গানেতে গন্ধেতে রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না গোছের জিনিস।

রাজা। কিছুই-না গোছের জিনিস! এ কি পরিহাস না কি!

মন্ত্রী। শুধু পরিহাস নয়, মহারাজ, এ দুর্দৈব।

রাজা। তাতে গল্প কিছু আছে?

মন্ত্রী। নেই বললেই হয়!

রাজা। যুদ্ধ?

মন্ত্রী। না

রাজা। কোনো রকমের রক্তপাত?

মন্ত্রী। না।

রাজা। আত্মহত্যা? পতন ও মূর্ছা?

মন্ত্রী। একেবারেই না।

রাজা। আদিরস? বীররস? করুণরস?

মন্ত্রী। না, কোনোটাই না। কবি বলেন, তিনি যা রচনা করেছেন তা শরৎকালের উপযোগী খুব হাল্কা রকমের ব্যাপার। তার মধ্যে ভার একটুও নেই।

রাজা। তাকে শরৎকালের উপযোগী বলবার মানে কী হল?

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হাল্কা, তার কোনো প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী।

রাজা। এ কথা সত্য বটে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে।

রাজা। এ কথা মানতে হয়।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের কাশের স্তবক না বাগানের না বনের; সে হেলাফেলায় মাঠে ঘাটে নিজের অকিঞ্চনতায় ঐশ্বর্য বিস্তার করে বেড়াচ্ছে। সে সন্ন্যাসী।

রাজা। এ কথা কবি বেশ বলেছে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরতে কাঁচা ধানের যে খেত দেখি কেবল আছে তার রঙ, কেবল আছে তার দোলা। আর-কোনো দায় যদি তার থাকে সে কথা সে একেবারে লুকিয়েছে।

রাজা। ঠিক কথা।

মন্ত্রী। তাই কবি বলেন, তাঁর শারদোৎসবের যে পালা সে ওই রকমই হাল্কা, ওই রকমই নিরর্থক। সে পালায় কাজের কথা নেই, সে পালায় আছে ছুটির খুশি।

রাজা। বা:, এ তো মন্দ শোনাচ্ছে না। ওর মধ্যে রাজা কেউ আছে?

মন্ত্রী। একজন আছেন। কিন্তু তিনি কিছুদিনের জন্যে রাজত্ব থেকে ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসীবেশে মাঠে ঘাটে বিনা কাজে দিন কাটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। বা: বা:, শুনে লোভ হয় যে! আর কে আছে?

মন্ত্রী। আর আছে সব ছেলের দল।

রাজা। ছেলের দল? তাদের নিয়ে কী হবে?

মন্ত্রী। কবি বলেন, ওই ছেলেদের প্রাণের মধ্যেই তো আসল ছুটির চেহারা। তারা কাঁচা ধানের খেতের মতোই নিজে না জেনে, কাউকে না জানিয়ে, ছুটির ভিতরেই ফসলের আয়োজন করছে। ...”[৯]

উল্লিখিত এই ভূমিকাংশ থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে বাংলায় নাটক রচনার একটা নতুন সচেতন বাঁকের সৃষ্টির যাত্রাপথ হলো এই ‘শারদোৎসব’ নাটকটি। ‘শারদোৎসব’ যেন ভারহীন এক সংগীতলহরী।

এ নাটক প্রাচীন ভারতের তপোবন কেন্দ্রিক জীবনের দিকেও ইঙ্গিত করেছে। মহান এই দেশ প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে সার্থক হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘তপোবন’ শীর্ষক রচনায় সেই কথা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন—

“এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফলফুল দিয়েছে, কুশ-সমিধ যুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম, অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদান-প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য ব্লে, নির্জীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক, বাতাস, অন্নজল প্রভৃতি যে- সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য

আকাশের নয়, একটি চেতনাময়, অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ-এইটি তাঁরা একটি অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন; সেইজন্যেই নিশ্বাস, আলো, অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যেই নিখিলচরাচরে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া। ... বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে, নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে পালন করেছে। ভারতবর্ষের যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ, সে দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন; রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায়নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।... ভারতবর্ষের পুরাণকথায় যা-কিছু মহৎ, আশ্চর্য, পবিত্র, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য, সমস্ত সেই প্রাচীন তপোবনস্মৃতির সঙ্গে জড়িত। ... মানব ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।”[১০]

বোঝাই যাচ্ছে প্রাচীন ভারতের আদর্শ ‘শারদোৎসব’ রচনার অন্যতম প্রেরণা হিসেবে কবির মনে জায়গা করে নিয়েছে। কবি তাঁর চৈতালি কাব্যের ‘তপোবন’ কবিতায় এই কথারই ছন্দবদ্ধ রূপ দিয়েছেন—

“মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন
পুরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্যে দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।
রাজা রাজ-অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি-স্রোতস্বিনীতীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাতবায়ে, ঋষিকন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে

আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যাজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্ককেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।”[১১]

শারদোৎসব আয়তনে ছোটো। প্রথাগত নাট্যপ্রকরণ এ নাটকে অনুসৃত হয় নি। মাত্র দুটি দৃশ্যে নাটকটি রচিত। অথচ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই এই নাটক সম্বন্ধে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে নানান রচনায় প্রচুর শব্দ খরচ করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং নাটকের মর্মবস্তুকে আমাদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। কিন্তু কেন এই একান্ত প্রয়াস? মনে হয় নতুন ধরনের এই নাটকের তত্ত্ব পুরনোয় অভ্যস্ত পাঠক-দর্শক কতটা বুঝতে পারবেন সে বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল। সেজন্য অনভ্যস্ত পাঠক-দর্শকের কাছে নতুন ধরনের এ জাতীয় সৃষ্টিকে বোধগম্য করে তুলতেই তিনি এই ভূমিকাটি গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য নিজসৃষ্টির তিনি যে একজন চমৎকার বিশ্লেষক সে কথা বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির মধ্যে সমর্পণ করেছিলেন। প্রকৃতির মধ্যেই তিনি ছুটি বা মুক্তি খুঁজেছিলেন। সেই আনন্দঘন প্রকৃতিমুগ্ধতার ছবি ধরা পড়েছে শারদোৎসবে। প্রকৃতি তাঁর কাছে কেবল সৌন্দর্য আস্বাদনের জগৎ নয়, কেবল প্রকৃতির রূপে নিজেকে হারিয়ে ফেলা নয়, প্রকৃতি তাঁর কাছে উদ্দীপক। এই প্রকৃতির সঙ্গে মিলনেই মানুষ পূর্ণ—এই সত্যকে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই রচিত হয়েছে-শারদোৎসব।

দুই

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক পর্যায়ের নাটক পরিকল্পনার যথার্থ সূত্রপাত ঘটেছে শারদোৎসব থেকে। নাটকের সূচনায় নাট্য পরিবেশটিকে সাংকেতিকতায় দ্যোতিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ চিত্রকল্পসমৃদ্ধ গানের ব্যবহার করেছেন। আমরা জানি নাটকের ‘নান্দীপাঠ’ হয়েছে যে গানটির মাধ্যমে সেখানে বুকের বসন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা একখানি প্রভাতবেলার ছবি ফুটে উঠেছে। ফলে এ কথা বলাই যায় যে বাংলা ‘রূপক-সাংকেতিক’ নাটকেরও প্রভাতের যাত্রাপথ

শুরু হয়েছে শারদোৎসব থেকেই। শারদোৎসব নাটকে দৃশ্য ও প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের মাধ্যমে শরতপ্রকৃতির লীলাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ধানের ক্ষেত, আকাশ, শুভ্র মেঘ, কাশবন, রৌদ্রছায়া, ইত্যাদি চিত্রকল্প শরৎকালের পরিচয়বাহী। বিভিন্ন বস্তুর অনুষঙ্গে সোনার চিত্রকল্প শারদোৎসবকে মুখরিত করে তুলেছে। এ নাটকের অধিকাংশ চিত্রকল্পই দৃশ্যরূপময়। এইসব চিত্রকল্প ব্যক্তিকে সীমা থেকে অসীমের দিকে নিয়ে চলেছে। নাটকে সংগীত নাট্যচিত্রকল্পের আশ্রয় হয়ে উঠেছে। কথা হয়ে উঠেছে এক সংগীত থেকে অন্য সংগীতে পৌঁছনোর সেতুমাত্র।

অমলেন্দু চক্রবর্তী মহাশয় মনে করেন—

> "উৎসব উৎসব খেলা এবং ঋণশোধ-ই 'শারদোৎসবে'র কেন্দ্রীয় প্রতিমা। নাট্য-পরিণতির যথার্থ তাৎপর্য প্রধানত: উক্ত প্রতিমাবর্গের সমন্বিত ব্যঞ্জনায় আকৃতিবদ্ধ হবার সুযোগ পায়।"[১২]

কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করা যাচ্ছে না। কারণ এই বক্তব্যের মধ্যে একটা অর্ধসত্য আছে। 'উৎসব উৎসব খেলা' চিত্রকল্প নিশ্চিত কিন্তু 'ঋণশোধ' চিত্রকল্প নয় মোটেই। 'ঋণশোধ' 'শারদোৎসবে'র কেন্দ্রীয় প্রতিমা নয়, কেন্দ্রীয় ভাবনা। তাঁর কথাতেও একপ্রকার ধরা আছে এই সত্য—

> "সন্ন্যাসীর সংলাপে 'ঋণশোধ'-এর প্রতিমা সবুজ ঐশ্বর্যময় ধানের খেত, নির্মল জলে পরিপূর্ণ বেতসিনী, তপস্বিনী লক্ষ্মী এবং দুঃখের দলে ফুটে ওঠা সোনার পদ্মের প্রতিমায় পরিবৃত। এই পারস্পরিক সহযোগিতার সুবর্ণ সুযোগেই 'ঋণশোধ'-এর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ক্রিয়াশীলতা অর্জন করে এবং নাট্যাভিপ্রায়ের অন্তর্গত বস্তুর অতীত বস্তুর স্তর স্পর্শ করে।"[১৩]

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে 'ঋণশোধ' শব্দটি নাটকের কেন্দ্রীয় ভাবনা মাত্র, চিত্রকল্প নয়। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, ভালোবাসার মতোই ঋণও একটি বিমূর্ত ধারণা। সেজন্যই 'ঋণশোধ'-এর ভাবনাকে 'সবুজ ধানের খেত', 'পরিপূর্ণ বেতসিনী', 'সোনার পদ্ম' ইত্যাদি বিভিন্ন

চিত্রকল্পের মাধ্যমে রূপ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এ বিষয়ে মোক্ষম প্রমাণ নাটকের ভেতরেই খুঁজে পাওয়া যায়—

> "সন্ন্যাসী।... আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে-"[১৪]

'শুভ্র ফুলটি' ঋণশোধের অন্যতম চিত্রকল্প। এই শুভ্রবর্ণ সন্ন্যাসীর মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে—

> "সন্ন্যাসী।...এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি! সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র!"[১৫]

ঋণশোধের বিশুদ্ধ এবং পবিত্র সৌন্দর্যকে 'শুভ্র ফুলে'র চিত্রকল্পে রূপ দেওয়া হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে চিত্রকল্প নিয়ে আবেগতাড়িত বিভ্রম তৈরি হয়েছে অমলেন্দু চক্রবর্তী মহাশয়ের মনে। ঠিক একই রকম আবেগতাড়িত বিভ্রম দেখা যায় চৈতালি সাহার মন্তব্যেও—

> "ঋণশোধ কথাটির মধ্যে ঋণের বোঝা বা ভারকে অনুভব করা যায়, কিন্তু এ নাটকে ঋণশোধ হয়েছে আনন্দোৎসবের মধ্যে দিয়ে। উপনন্দ যে কঠোর পরিশ্রম করেছে, তার মধ্যেও সে এক স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করেছে। উপনন্দ প্রসঙ্গে যে 'শুভ্র ফুল' প্রতিমার উল্লেখ হয়েছে, সমগ্র নাটকটিই যেন সেই 'শুভ্র ফুলে'র পবিত্রতা উৎসবের আনন্দের মধ্য দিয়ে বহন করে আনছে। ফলে নাটকটিতে গভীর ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে শরৎপ্রকৃতি। গোটা নাটকে শরৎঋতুটিকেই এক প্রতিমা হিসেবে উল্লেখ করা যায়।"[১৬]

এই দাবি মেনে নেওয়া যায় না এই কারণেই যে 'শারদোৎসবে' 'শরৎঋতু' পটভূমিকা হিসেবে স্থান পেয়েছে, চিত্রকল্প হিসেবে নয়। চিত্রকল্প বিচারে বিশ্লেষকের বিভ্রম নয়, বিশ্লেষকের নিরাসক্ত মনোভাব অত্যাবশ্যক। 'ঋণশোধ' যেহেতু নাটকের কেন্দ্রীয় ভাবনা এবং 'শরৎঋতু' যেহেতু নাটকের পটভূমি সেহেতু 'সংগীত' এই নাটকে চিত্রকল্পের স্থান গ্রহণ করেছে আপাতভাবে এ কথা বলা যেতে পারে। কেননা সংগীত শ্রবণেন্দ্রিয় নির্ভর শ্রুতিচিত্রকল্প এবং এ

নাটকে সংগীতই প্রধান হয়ে উঠেছে। দর্শক-শ্রোতার দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবি সংগত। কিন্তু একটু তলিয়ে আবেগকে সংগুপ্ত রেখে বিচার করলেই বোঝা যায় পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবি সম্পূর্ণ অসংগত। কারণ পাঠ্যনাটক চিত্রকল্পের পঞ্চেন্দ্রিয় নির্ভর বস্তুর নির্দিষ্ট প্রতীক বা অবয়ব দাবি করে। সেজন্য সংগীত অন্য অনেক রবীন্দ্রনাটকের মতো এ নাটকেও অনেকগুলো প্রধান চিত্রকল্পের আশ্রয় হয়ে উঠেছে এ কথা বলা অধিকতর যুক্তিসংগত।

অবশ্য চিত্রকল্প যে সব সময় সরাসরি অবয়ব নিয়ে এসে হাজির হবে এমন দাবি অসঙ্গত। আভাসেও চিত্রকল্প গোপনে লুকিয়ে থাকতে পারে। 'ঋণশোধ'-এর শব্দবন্ধে সেই আভাস থাকলেও চিত্রকল্প অন্বেষণ অমূলক। কিন্তু এই নাটকেই রবীন্দ্রনাথ অসামান্য একটি চিত্রকল্পের নমুনা আভাসে গেঁথে দিয়েছেন—

> "সন্ন্যাসী। চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।"[১৭]

'চোখের পাতা' বা 'পুঁথির পাতা'র স্পষ্ট অবয়ব থাকা সত্ত্বেও আসল চিত্রকল্পটি এখানে ধরা আছে ইঙ্গিতে। পুঁথিপ্রতিবন্ধকতা রবীন্দ্রসাহিত্যে এক চেনা ছবি। সেই ছবিটিই এখানে ফুটে উঠেছে 'প্রাচীরে'র চিত্রকল্পে। পুঁথির পাতা চোখের পাতার উপরে খাড়া হয়ে প্রাচীর তুলে দৃষ্টিকে সংকীর্ণ করে তুলেছে। সেজন্য 'শারদোৎসবে'র সৌন্দর্য উপভোগের পথে 'পুঁথির পাতা' প্রাচীরের রূপ পেয়েছে। চৈতালি সাহার মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়—

> "পৃথিবীর অসীম সৌন্দর্য উপভোগের জন্য চাই মন ও চোখ। চোখের পাতা যদি পুঁথির পাতার আড়ালে ঢাকা থাকে অর্থাৎ মানুষ যদি শুধু তার সীমিত গণ্ডীর মধ্যে বসে জ্ঞান সঞ্চয় করতে চায় তবে বিশ্বের অফুরন্ত সৌন্দর্য থেকে সে বঞ্চিত হবে। রাজা এতদিন রাজধানীর প্রাচীরের আড়ালে কর্তব্যের বাঁধনে বাঁধা ছিলেন, আজ পথে এসে অফুরন্ত মুক্তির স্বাদ বুকে নিয়ে প্রকৃতি তথা জীবনকে চিনতে চান।"[১৮]

শারদোৎসবে 'আলো'র চিত্রকল্প আনন্দের মূর্তরূপ পরিগ্রহ করেছে। নাটক শুরুর আগে একটি গানে তারই প্রতিচ্ছবি—

"আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে

দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,

আকাশেতে সোনার আলোয়

ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।"[১৯]

প্রভাতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আলোর ইঙ্গিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—

"সন্ন্যাসী। বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে বাইরে মিলে যেতে হবে তো, নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারব কী করে? আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিলব বলেই তো উৎসব।"[২০]

সন্ন্যাসীর সংলাপে উৎসবের অন্তর্নিহিত সত্য আলোর ইশারায় ফুটে উঠেছে। আলোর মরমী সংকেতে আনন্দময় অন্তরের ছবিটি রূপ পরিগ্রহ করেছে। এমনকি অন্ধকারও এই নাটকে আলোর সংকেতে ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত হয়েছে—

"সন্ন্যাসী। ... তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে! দ্বার খুলেছে তাঁর! দেখতে পাচ্ছ কি শারদা বেরিয়েছেন? দেখতে পাচ্ছ না? দূরে, দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে! সেখানে চোখ যে যায় না! সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলে প্রথমতম শিখরটির কাছে! সেখানে প্রতিদিন ঊষার প্রথম পদক্ষেপটি পড়লেও তবু তাঁর আলো চোখে এসে পৌঁছয় না, অথচ ভোরের অন্ধকারের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে-সেই অনেক অনেক দূরে!"[২১]

এখানে আলো অন্ধকারের বা অন্ধকার আলোর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। 'অন্ধকারের সর্বাঙ্গে কাঁটা' প্রকৃতপক্ষে আলোর প্রতিভাস।

নদীর চিত্রকল্পে 'ঋণশোধ' এর ছবি—

"সন্ন্যাসী। —জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। ... সেইজন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ! ..."[২২]

নদীর চিত্রকল্পের মতো সমুদ্রের চিত্রকল্পও এই নাটকে গভীর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। ঠাকুরদা ও সন্ন্যাসীর কণ্ঠে সংগীতাশ্রিত ইন্দ্রিয়ময় সমুদ্রের চিত্রকল্পে ইন্দ্রিয়াতীতের আকুতি ধরা পড়েছে—

"ঠাকুরদাদা।

আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধ'রে আজ বোস রে সবাই, টান রে সবাই টান।
বোঝা যত বোঝাই করি
করব রে পার দুঃখের তরী,
ঢেউয়ের' পরে ধরব পাড়ি—
যায় যদি যাক প্রাণ।"[২৩]

"সন্ন্যাসী।

লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া!"[২৪]

সাগর এবং তার অনুষঙ্গে দাঁড়, তরী, পাল, ইত্যাদি চিত্রকল্পের অবতারণায় অপার অসীমকে স্পর্শ করার একান্ত ব্যাকুলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সৌন্দর্যের পূজারী ঠাকুরদাদার কাছে প্রকৃতি ধরা দিয়েছে সমগ্রতায়। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়ময় রূপের মধ্যেও অতীন্দ্রিয় রহস্যানুভূতির সন্ধান দিয়েছে। একটি ঘ্রাণচিত্রকল্প তাঁর ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে—

"ঠাকুরদাদা। ... শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, ..."[২৫]

'পুজোর গন্ধ' চিত্রকল্পের মধ্যে অবকাশ যাপনের ছবি ফুটে উঠেছে।

'সোনার পদ্ম' চিত্রকল্পে মানবাত্মার পূর্ণবিকাশের কথা বলা হয়েছে। নেওয়া নয় বরং দেওয়ার আনন্দেই মানুষ পূর্ণতা পায়। নিজেকে উৎসর্গিত করেই মানুষ সুন্দরের প্রকাশ ঘটায়। প্রকৃতির মধ্যেও সেই একই লীলা—

"সন্ন্যাসী।... লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।"[২৬]

মানুষ হোক বা বিশ্বপ্রকৃতি-ঋণশোধের ভেতর দিয়েই বিকশিত হতে হয়। এই পথেই ক্রমমুক্তি। এই পথ ধরেই উভয়ের পরম মিলন ঘটে। বিকশিত পদ্মপাপড়ির অনবদ্য শোভা ঝলমলে পূর্ণতার মতোই মানুষও পূর্ণবিকশিত হয়। সেজন্য পদ্মের চিত্রকল্পে এক বিশুদ্ধ সৌন্দর্যময় সত্তাকে রূপ দেওয়া হয়েছে। উপনন্দের সাধনা এবং ঋণশোধের সৌন্দর্যের মধ্যে সন্ন্যাসী রাজা স্বর্ণলক্ষ্মীর সোনার পদ্মের খোঁজ পেয়েছেন—

"সন্ন্যাসী। লক্ষ্মী যখন মানবের মর্তলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন; শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে, সে খবরটি আজ উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।"[২৭]

শ্রুতিকেন্দ্রিক চিত্রকল্প 'বীণা' এই নাটকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। লক্ষেশ্বরের কাছে দেনা রেখে বীণাচার্য সুরসেনের প্রয়াণ ঘটেছে। সেই দেনা শোধের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে উপনন্দ। উপনন্দেরও দেনা আছে তার প্রভুর কাছে। অল্প বয়সে পিতৃহীন উপনন্দ বাইরে থেকে নতুন নগরে এসেছিলো আশ্রয়ের খোঁজে—

> "উপনন্দ।... সেদিন শ্রাবণমাসের সকালবেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এক কোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করেছিলেম। পুরোহিত আমাকে বোধহয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন; বললেন, এসো বাবা, আমার ঘরে এসো। সেইদিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন-লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে, তিনি কান দেননি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তাহলে কিছু কিছু উপার্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব। তিনি বললেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয়; আমার আর-এক বিদ্যা জানা আছে, তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে আমাকে রঙ দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানত।"[২৮]

উপনন্দের কাছ থেকে সুরসেনের জীবনবৃত্তান্ত শুনে সন্ন্যাসী রাজা 'পাগল' মানুষটির মধ্যে শিল্পী তথা উদারচেতা সত্তাটিকে আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মনের ভেতর সুরসেনের বীণার ধ্বনিমন্ত্র আস্বাদনের ইচ্ছে ছিল। বীণাচার্যের অবর্তমানে সেই ইচ্ছেপূরণ আর সম্ভব নয়। কিন্তু বীণার পার্থিব ধ্বনিমন্ত্রকে ছাড়িয়ে তিনি অপার্থিব এক সুরের সন্ধান পেয়ে গেছেন যা অবিস্মরণীয়। বীণাচার্য সুরসেনের সঙ্গে উপনন্দের সম্বন্ধ দু'জনের প্রাণের তন্ত্রীতে যে সুরের ঢেউ তুলেছে সন্ন্যাসী তা আস্বাদন করেছেন—

> "সন্ন্যাসী। সুরসেনের বীণা শুনতে পেলাম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর-এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনোদিন ভুলব না।–"[২৯]

উপনন্দের সৌজন্যে উপস্থাপিত বীণার চিত্রকল্প সন্ন্যাসীর কাছে প্রতীকী জীবনবীণায় রূপান্তরিত এ কথা বলাই যায়।

বীণাচার্য নেই কিন্তু বীণা আছে। সুরসেন নেই কিন্তু সুর রয়ে গেছে। উপনন্দের সংলাপে ও জীবনে তাই বীণা ও বীণার সুর ঘটমান বর্তমান, চির-উদ্দীপক—

> "উপনন্দ। মনে করেছিলুম, লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠল-অমনি আমার মনটার ভিতের যে কেমন হল সে আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল।..."[৩০]

নাটকে একই চিত্রকল্প যুগপৎ সংলাপে ও সংগীতে দু'স্থলেই ধরা দিয়েছে। তবে সংগীতাশ্রিত চিত্রকল্প তুলনামূলক ভাবে অধিক গতিশীল। যেমন বীণা চিত্রকল্পটি নাটকের আবাহন-গানে অনেক বেশি প্রসারতা ও প্রবহমানতা লাভ করেছে—

"গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,
হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।"[৩১]

নাটকের শেষে শেষ গানেও সেই গতিশীলতা বিদ্যমান—

"আকাশ বীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী!"[৩২]

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যে বীণার চিত্রকল্প বিভিন্ন সূক্ষ্ম ভাবনা প্রকাশের সহায়ক। শারদোৎসবেও তা পরিলক্ষিত হয়।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৬০, পৃ. ৫৪৬

২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৪২-৫৪৪

৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৪৪-৫৪৬

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম কামিনী সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১০৫-১০৬

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, প্রথম কামিনী সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৩১

৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৩১

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৬০, পৃ. ৫৪৭

৮. কনক বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক, এস ব্যানার্জি এন্ড কোং, প্রথম সংস্করণ ২৫ শে বৈশাখ ১৩৭২, পৃ. ৫২

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৬০, পৃ. ৫৪৭-৫৪৯

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, প্রথম কামিনী সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৭৯০

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম কামিনী সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৬

১২. অমলেন্দু চক্রবর্তী : রবীন্দ্রনাটকে বাকপ্রতিমা, সুচেতনা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২২০

১৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ২২২

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৫৬৩

১৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৭৫

১৬. চৈতালি সাহা : রবীন্দ্রনাট্যে প্রতিমা, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১০৬

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৫৬২

১৮. চৈতালি সাহা : রবীন্দ্রনাট্যে প্রতিমা, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১০৪

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৫৫৯

২০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৭৪

২১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৭৬

২২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৭২

২৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৬৪

২৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৭৬

২৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৬৩

২৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৬৮

২৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৭২

২৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৬৫-৫৬৬

২৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৬৬

৩০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭০

৩১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৭৬

৩২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৮২

ফাল্গুনী

'ফাল্গুনী' গতিরাগের নাট্যরূপ। কনক বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ যখন 'ফাল্গুনী' (১৩২২) রচনা করেন, তখন তাঁহার কাব্যজগতে চলিতেছে 'বলাকা'র (১৩২১-২৩) যুগ। 'বলাকা'য় রবীন্দ্র-কবিমানস স্পষ্টতই একটা মোড় ঘুরিয়াছিল। কবি তখন গতিস্রোতের যাত্রী, গতিকেই জীবনের ও জগতের একমাত্র সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। বিশ্বসৃষ্টি এক গতিরই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, জরা-যৌবন জন্মমৃত্যু সকলই সেই প্রবাহেরই অঙ্গ।"[১]

শীত পার হয়ে যেমন বসন্ত আসে, ঠিক তেমনই মৃত্যুকে অতিক্রম করে মানুষ পায় নতুন জীবন—এটাই ফাল্গুনীর মর্মকথা। জরা ও যৌবনের প্রসঙ্গে এ কথাকে নাটকে রূপ দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে মনে করা হয়—জরার ভেতর দিয়ে যৌবন ফুরিয়ে যায়, মৃত্যুর ভেতর দিয়ে শেষ হয়ে যায় জীবন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন মৃত্যুর ভেতর দিয়েই জীবনকে নবরূপে লাভ করা যায়। সেজন্য তিনি কবিশেখরের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন—

"প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।"[২]

আর ফল না চাওয়া এবং ফলতে চাওয়া অর্থাৎ ত্যাগ করতে শেখা এই যে আসক্তিহীন যৌবন, এই যৌবনই একমাত্র সঠিকভাবে জীবনের রস গ্রহণে সক্ষম। যুবকের দল তাদের চুলে পাক না ধরিয়েও দুঃখের অভিজ্ঞতা পার হয়ে এসে আসক্তিহীন যৌবনের তটভূমিতে উপনীত হয়।

ফাল্গুনী নাটকের এই 'ভিতরকার কথাটি' রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

“ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি এতই সহজ যে, ঘটা করে তার অর্থ বোঝাতে সংকোচ বোধ হয়।

জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়-আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান-অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকচ্ছে, ডাল মরছে। জরা মৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল, সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো। জরাকে মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয়, সামনের দিক থেকে সেটাকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত, তা হলে অনাদি কালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়তো, এর উপরে যেখানেই পা দিতুম ধ্বসে যেতো।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনবীন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষপ্রকৃতির মধ্যেও সে লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে, তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না।

ফাল্গুনীর যুবকদল প্রাণের উদ্দাম বেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্ছে। সর্দার বলছে, ‘ভয় নেই, বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করি নে-আচ্ছা দেখ, যদি তাকে ধরতে পারিস তো ধর।’ প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে, চিরন্তন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেত।”[৩]

ফাল্গুনী নাটকের মর্মোদ্‌ঘাটন করার জন্য রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্র বা ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যাতার ভূমিকা পালন করেছেন। এ নাটকের আবেদন অনুভূতির কাছে, এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কেবল যুক্তিতর্ক বা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা প্রতিপাদ্য অসম্ভব। সেজন্য তিনি ব্যাখ্যাতার কলমটি হাতে তুলে নিয়েছেন—

> "জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই ব'লে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, —সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারি নে, তখন পিছনদিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে—সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দার মৃত্যুর তোরণ—দ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। 'ফাল্গুনী'র গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছানো যায়। তাই যুবকেরা বললে, —আনব সেই জরা-বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা, এই বসন্ত-উৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায়-তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব-বসন্তের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তে হোলিখেলা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চির-নবীন অমর মূর্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েছে। তাই 'ফাল্গুনী'তে বাউল বলছে—'যুগে যুগে মানুষ লড়াই করছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ। যারা মরে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারা পত্র পাঠিয়েছে। দিগদিগন্তে তারা রটাচ্ছে-আমরা পথের বিচার করি নি; আমরা

পাথেয়ের হিসেব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তা হলে বসন্তের দশা কি হতো? —বসন্তের কচি পাতায় এই যে পত্র, এ কাদের পত্র? যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে—তারাই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তা হলে জরাই অমর হতো, পুরাতন পুঁথির কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হয়ে যেত, সেই শুকনো পাতার সরসর শব্দে আকাশ শিউরে উঠত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন চির-নবীনতা প্রকাশ করে—এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ করে জীবন্মৃত হয়ে থাকে—প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

চন্দ্রহাস। এ কী, এ যে তুমি! সেই আমাদের সর্দার? বুড়ো কোথায়।

সর্দার। কোথাও তো নেই।

চন্দ্রহাস। কোথাও না? তবে সে কী।

সর্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে, তারা যে তোমাকে কত রকম মনে করলে তার ঠিক নেই। তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। তারপর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে-এখন মনে হচ্ছে তুমি বালক, —যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম। এ তো বড়ো আশ্চর্য। তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।”[৪]

ফাল্গুন চিরযৌবনের প্রতীক, যে যৌবন চলার মন্ত্রে দীক্ষিত, যার আপাত রূপান্তর আছে কিন্তু ক্ষয় নেই। এক বিজ্ঞানসম্মত আবিষ্কারকে রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে রূপ দিয়েছেন। এই অর্থে নাটকটি ব্যঞ্জনাধর্মী এবং গভীর তাৎপর্যে উন্নীত। নাটকের অন্য এক তাৎপর্যের দিকে সমালোচক আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন—

> "পথ, ঘাট, মাঠ ও গুহাদ্বার–নাটকের এই চারিটি স্থান-সংকেতও গভীর অর্থবহ। জীবনের স্বরূপই চলা, পথ সেই চলারই অঙ্গ। ঘাট পথেরই একটা প্রান্ত। ইহা দৃষ্টিহীনতার প্রথাসর্বস্বতার প্রতীক। এখানে আসিলে তাই ঘাটের মাঝির সঙ্গেই দেখা হয়-যে বলে, "আমার ব্যবসা হচ্ছে পথ ঠিক করা—কাদের পথ, কিসের পথ সে আমার জানবার দরকার হয় না। আমার দৌড় ঘাট পর্যন্ত-ঘর পর্যন্ত না।" মাঠ স্থিতির প্রতীক, তাই এখানে আসিলে যুবকদলের মনে হয়, 'সংসারটা সবই ছল রে!' তাহারা আর চলিতে চায় না, বলে, "আমরা চলব না।" গুহাদ্বার—যে মৃত্যুর প্রতীক, এত কথার পর আর নিশ্চয়ই বলিয়া দিতে হয় না। এইখানেই যুবকদলের সঙ্গে সর্দারের নূতন করিয়া দেখা হয়, অর্থাৎ মৃত্যুর ভিতর দিয়াই জীবনরহস্য হয় উন্মোচিত।"[৫]

নাটকটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে ধরা আছে যৌবনের ধারণা নিয়ে আলোচনা। সেই আলোচনায় রাজা, আমলা, কবি প্রমুখ চরিত্র অংশগ্রহণ করেছেন। রাজকর্মীরা স্বভাবত রাজার প্রতি অনুগত। রাজা, রাজকর্মীরা সুখের জন্য অধিক লালায়িত কিন্তু মন্ত্রী বা অন্যদের মধ্যে তেমনটা দেখা যায় না। বরং তারা তাদের কাজের প্রতি আগ্রহী, তারা কর্মব্যস্ত, চঞ্চল। যুদ্ধের সংবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রী যখন রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী তখন রাজকর্মীরা তাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য চীন-সম্রাটের দূতকে অপেক্ষা করতে হয়। কারণ রাজার মন খারাপ এবং রাজার মন খারাপের বিষয়টা একটা সাংঘাতিক সর্বনাশের লক্ষণ।

ফাল্গুনীর ভূমিকায় যে রাজা রয়েছেন বয়স বাড়ার কারণে তাঁর কানের কাছে পাকা চুল আবিষ্কৃত হয়; সেটাকে তাঁর যৌবনের ইতি বলে ধরে নিয়ে রাজার খুব মন খারাপ। এই

সমস্যার কোনো সমাধান নেই মনে করে তিনি পুরোপুরি আশাহত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। রাজকর্মে তাঁর মন নেই। রাজধর্মপালনের ইচ্ছাও নেই—

"কিসের রাজকার্য। রাজকার্যের সময় নেই—"[৬]

রাজপণ্ডিত শ্রুতিভূষণ তাঁকে কর্মে নিরুৎসাহিত করায় তিনি আনন্দিত। শ্রুতিভূষণের বাণী—

"শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে,

আশার শৃঙ্খল কিন্তু অদ্ভুত এ ভবে।

সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,

সে-বন্ধন ছাড়ে যারে স্থির হয়ে থাকে।"[৭]

—এই বাণী শুনে রাজা উদ্বেলিত। তিনি শ্রুতিভূষণের জন্য সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার হিসেবে ঘোষণা করেন। অথচ প্রজাদের দুরবস্থা-দুর্ভিক্ষকে অন্ন নয়, সৈন্য দিয়ে প্রতিহত করার আয়োজনের কথাও ধ্বনিত হয়ে ওঠে। ক্ষুধার্ত ও নিরন্ন প্রজারা রাজার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। রাজা সবাইকে, সবকিছুকে এড়িয়ে গিয়ে বৈরাগ্যসাধনের আয়োজনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁকে খানিকটা ক্লান্ত দেখায়। জীবন-যৌবনের সমাপ্তির কথা ভেবে তিনি আতঙ্কিত ও পীড়িত। কবিশেখরকে তিনি বিদায় সংবাদ প্রদান করেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছে—যৌবনকালই কবিত্ব প্রকাশের একমাত্র কাল। কিন্তু কবিশেখর তা মনে করেন না—

"কবি। মহারাজ, আপনার এই কবিকে নাকি বিদায় করতে চান।

রাজা। কবিত্ব যে বিদায়-সংবাদ পাঠালে, এখন কবিকে রেখে হবে কী।

কবি। সংবাদটা কোথায় পৌঁছল।

রাজা। ঠিক আমার কানের উপর। চেয়ে দেখো।

কবি। পাকাচুল? ওটাকে আপনি ভাবছেন কী।

রাজা। যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে সাদা করার চেষ্টা।

কবি। কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ঐ সাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রঙ লাগবে।

রাজা। কই রঙের আভাস তো দেখি নে।

কবি। সেটা গোপনে আছে। সাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

রাজা। চুপ, চুপ, চুপ করো, কবি, চুপ করো।

কবি। মহারাজ, এ-যৌবন ম্লান যদি হল তো হোক-না। আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।”[৮]

যৌবনের এক নতুন রূপের কথা কবি বলেছেন। যে যৌবন মানুষকে নতুন হওয়ার সুযোগ করে দেয়। ‘আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন’ অর্থাৎ যৌবন অনন্ত। সংসারের দুঃখ-দৈন্য সবকিছুকে কবি এই যৌবনস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চান নদীর মতো। রাজাকে তিনি বলেন—

“নদী কেমন করে ভার বহন করে দেখেছেন তো। মাটির পাকা রাস্তাই হল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই তো ভারকে কেবলই সে ভারী করে তোলে। বোঝা তার উপর দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাই তো সে আপনার ভার লাঘব করেছে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে।”[৯]

নিরুৎসাহিত হয়ে বসে থাকা নয়, বরং নদীর মতো নিজেকে ঢেলে দেওয়ার মধ্য দিয়েই মানবযৌবন খুঁজে পেতে পারে তার পরিপূর্ণতার, তার সার্থকতার বৃহত্তর পরিচয়।

কবির যুক্তি রাজার মনে ধরে। তিনি উৎসাহিত হন। জীবনের প্রতি যে ক্ষণিক বীতরাগ দেখা দিয়েছিল তা তিনি মন থেকে মুছে ফেলেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের প্রতি কর্তব্যপালনে উন্মুখ হয়ে ওঠেন—

"দুর্ভিক্ষকাতর প্রজাদের বিদায় করবার ভালো উপায় অন্ন দিয়ে, সৈন্য দিয়ে নয়।"[১০]

এ কথার ভেতরে রাজার মধ্যে প্রজাবাৎসল্যের ভাবটিকে ফুটে উঠতে দেখা যায়। কবিশেখরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একই সঙ্গে কর্তবমুখী ও জীবনমুখী হয়ে উঠলেন। 'কবি'কে বিদায় দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু এবার তিনি 'পণ্ডিত'কে বিদায় দিতে প্রস্তুত—

"যাক গে শ্রুতিভূষণ। ওহে কবিশেখর, আমার কী মুশকিল হয়েছে জান। তোমার কথা আমি এক বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারি নে অথচ তোমার সুরটা আমার বুকে গিয়ে বাজে। আর শ্রুতিভূষণের ঠিক তার উলটো; তার কথাগুলো খুবই স্পষ্ট বোঝা যায় হে—ব্যাকরণের সঙ্গেও মেলে—কিন্তু সুরটা—সে কী আর বলব।"[১১]

কিংবা,

"প্রতিহারী। মহারাজ!

রাজা। কী প্রতিহারী।

প্রতিহারী। বৈরাগ্যবারিধি নিয়ে শ্রুতিভূষণ এসেছেন।

রাজা। সর্বনাশ করলে। ফেরাও তাকে ফেরাও। মন্ত্রী, দেখো হঠাৎ যেন শ্রুতিভূষণ না এসে পড়ে। আমার দুর্বল মন, হয়তো সামলাতে পারব না, হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে বৈরাগ্যবারিধির ডুব-জলে গিয়ে পড়ব। ওহে কবিশেখর, আমাকে কিছুমাত্র সময় দিয়ো না—প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখো—একটা যা-হয়-কিছু করো—যেমন এই ফাল্গুনের হাওয়াটা যা-খুশি-তাই করছে তেমনিতর।"[১২]

দ্বিতীয় পর্যায়টিই নাটকের প্রাণ। এই পর্বের আরম্ভেই প্রথম দৃশ্যের গীতি-ভূমিকায় তিনটি গানের মাধ্যমে নবীনের দলের আগমনের বার্তা আভাসিত হয়েছে। তৃতীয় গানটিতে নবীনের চরিত্রধর্ম সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

"ওগো নদী, আপন বেগে
পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা।

ওগো নদী, চলার বেগে
পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হয়ে
আপন-হারা।
আমার চলা যায় না বলা,
আলোর পানে প্রাণের চলা,
আকাশ বোঝে আনন্দ তার,
বোঝে নিশার নীরব তারা।"[১৩]

এই নবীন-যুবকের দল দ্বন্দ্ব ও দুঃখের পথে ভয়হীনভাবে এগিয়ে চলেছে। নদীর প্রবহমানতার মধ্যে তারা খুঁজে পেয়েছে নিজেকেই। এই যুবকের দল সবসময় প্রাণবন্ত, সজীব, চঞ্চল। চন্দ্রহাস এদের প্রিয় সখা, নেতা ও অগ্রদূত। জীবনের প্রতি চন্দ্রহাসের অপরিসীম শ্রদ্ধা

ও ভালোবাসা লক্ষ্য করা যায়। সেও সর্দারের মতো পরিব্যাপ্ত সময়সমুদ্রে চিরযৌবনের আধার। সে শুধুই চলে। ক্রমাগত চলাই তার ধর্ম। যুবকের দল তার সম্বন্ধে চমৎকার মূল্যায়ন করেছে—

"দেখ দেখি ভাই, আবার আমাদের ফেলে রেখে চন্দ্রহাস কোথায় গেল।

ওকে কি ধরে রাখবার জো আছে।

বসে বিশ্রাম করি আমরা, ও চলে বিশ্রাম করে।"[১৪]

চন্দ্রহাস যেন এক চলমান সময়। তার মধ্য দিয়ে সময়ের চরিত্র নির্মিত হয়েছে এ কথা বলা যেতেই পারে।

দাদা চরিত্রটির দেহের বয়স কম কিন্তু মানসিকতায় সে বুড়ো। সেজন্য চন্দ্রহাসের কথায় আক্ষেপের সুর—

"পৃথিবীর ধুলোমাটি পর্যন্ত শিউরে উঠেছে আর এ পর্যন্ত দাদার গায়ে বসন্তের আমেজ লাগল না।"[১৫]

দাদা প্রদত্ত বয়সের অজুহাত যুবকের দল মেনে নেয় নি—

"পৃথিবীর বয়স অন্তত তোমার চেয়ে অনেক কম নয়, কিন্তু নবীন হতে ওর লজ্জা নেই।"[১৬]

আসলে নবীনতার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বিশ্বপ্রাণের প্রকৃত সচল রূপ। কিন্তু অসময়ে বুড়িয়ে যাওয়া দাদার পক্ষে এই সত্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। সে কোটরে বসে কবিতা লেখে এবং তার কবিতা খুব সারগর্ভ বলে দাবি করে। কিন্তু তার কথায় যুবকের দলের কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। তাদের আগ্রহ কেবল সময়স্রোতে ছুটে চলার দিকে যা দাদার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। ফলে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। দাদা সর্দারের কাছ থেকে এই দ্বন্দ্বের নিরসন চায়। কিন্তু সর্দার জানায়—

"আমি কিছুরই নিষ্পত্তি করি নে। সংকট থেকে সংকটে নিয়ে চলি-ঐ আমার সর্দারি।"[১৭]

দাদার এসব "ছেলেমানষি"[১৮] কথা পছন্দ হয় না। কিন্তু এই ছেলেমানুষীই আবার যুবকদের কাছে খুব পছন্দের ব্যাপার। তাদের ধারণা-দাদা যেকোনো দিন মান্ধাতার আমলের জরাবৃদ্ধের কাছে মন্ত্র নিতে যাবেন। বার্ধক্য তো দেহের নয়, মনের ধর্ম এবং সেটাই দাদাচরিত্রের মধ্যে রূপ পেয়েছে। কিন্তু যুবকের দল মান্ধাতার আমলের জরাবুড়োকে নিয়েই বসন্ত-উৎসবে মেতে উঠতে চায়। নাটকে আদ্যিকালের এক বুড়ো চরিত্রের কল্পনা-কথা আছে। এ বুড়ো যৌবনের শত্রু-জীর্ণ জরার প্রতীক। সে এই পৃথিবীর কাছে বোঝাস্বরূপ। তার ভারে পৃথিবী একপ্রকার ক্লান্ত। শোনা যায় সে থাকে অজানা এক গুহার ভেতরে। তাকে সেখান থেকে বের করে এনে যুবকের দল নতুন রঙে রাঙাতে চায়। কিন্তু সে তো বাস্তবে নেই। সে তো স্বপ্ন মাত্র। এখানেই ধরা দিয়েছে একদিকে জরা আর একদিকে যৌবনের দ্বন্দ্ব। জরা ও যৌবনের দুটি পক্ষ—প্রবীণের এবং নবীনের দল নাটকে ধরা দিয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে প্রবীণ-নবীন ব্যাপারটা মুখ্যত মানসিক; বয়স এখানে গৌণ। এই দুই দলের একদিকে আছে যুবকের দল, চন্দ্রহাস, সর্দার, অন্ধবাউল আর একদিকে আছে কোটাল, দাদা প্রমুখেরা। এদের মন ও মানসিকতার দ্বন্দ্ব নিয়েই গড়ে উঠেছে নাটকটি। এ নাটকে সময় এক শাশ্বত চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

ফাল্গুনী যেন সংগীতের সমুদ্র। গদ্যের আপাতকাঠিন্য বা সীমাবদ্ধতাকে এ নাটকে "গানের চাবি"[১৯] দিয়ে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। 'গানের চাবি' অর্থাৎ সুরের মায়াজাল বিস্তারের পাশাপাশি কথার রেখাও তৈরি হয়ে উঠেছে। নাটকের তত্ত্বকথায় মৃত্যুর ভেতর দিয়েই জীবনকে নবরূপে লাভ করার যে ইঙ্গিত আছে তা বাউলের গানে সুন্দরভাবে ধরা আছে—

"তোমায় নতুন করেই পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে তুমি
হও যে অদর্শন

ও মোর ভালোবাসার ধন।

ও গো তুমি আমার নও আড়ালের,
তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও যে নিমগন
ও মোর ভালোবাসার ধন।
আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি
ভয়ে কাঁপে মন
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।

তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে
শেষ করে দাও আপনাকে যে,
ওই হাসি রে দেয় ধুয়ে মোর
বিরহের রোদন
ও মোর ভালোবাসার ধন।"[২০]

কেবল বক্তব্যকে স্পষ্টতা দেওয়ার জন্য নাটকে গানের প্রয়োগ করা হয় নি। তাই দেখা যায়, অনিবার্যভাবে নাটকে সংলাপ হিসেবেও গানের প্রয়োগ ঘটেছে।

"চন্দ্রহাস। আমরা যাব।

কোটাল। কোথায়?

চন্দ্রহাস। সেটা আমরা ঠিক করি নি।

কোটাল। যাওয়াটাই ঠিক করেছ কিন্তু কোথায় যাবে সেটা ঠিক কর নি?

চন্দ্রহাস। সেটা চলতে চলতে আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

কোটাল। তার মানে কী হল।

তার মানে হচ্ছে—

গান

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন-তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি।
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙিন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।

কোটাল। তোমরা বুঝি কথার জবাব দিতে হলে গান গাও?

হাঁ। নইলে ঠিক জবাবটা বেরয় না। সাদা কথায় বলতে গেলে ভারি অস্পষ্ট হয়, বোঝা যায় না।”[২১]

শারদোৎসব-এ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা ভারসাম্য ছিল। সেখানে মানুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই ঋণশোধের কাজটি করেছে। কিন্তু ফাল্গুনীতে প্রকৃতিই মানুষের বিকল্প হয়ে উঠেছে—

“তিনি প্রকৃতিকে মানুষের বিকল্প, দোসর করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, এবং প্রকৃতির লীলার মধ্যেই মানুষের লীলার ছবি যেন দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার শেষের জীবনের কাব্যসাধনা প্রকৃতিকে মানুষের বিকল্পরূপে দাঁড় করাইতে নিযুক্ত; প্রকৃতির শান্তিসরোবরে সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ক্ষুদ্র খণ্ড মানবজীবন স্নিগ্ধ হইয়া অখণ্ড পূর্ণতায়

প্রতিফলিত হইয়াছে, কবি তাহাই নির্নিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন; প্রত্যক্ষত মানবজীবনের দিকে তাকাইবার আকাঙ্ক্ষা এইভাবে পূরণ করিয়া লইয়াছেন। মানুষের বিকল্প প্রকৃতি হইয়া উঠিবার ইতিহাসে ফাল্গুনী একটি পতাকাস্থান, বা মোড় ঘুরিবার মুখ। বলাকা ও ফাল্গুনী সমসাময়িক; ইহার পর হইতে কাব্যে নাট্যে সংগীতে মানবমুখী কবি প্রকৃতিমুখী হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিমুখিতাও মানবমুখিতা; কারণ, প্রকৃতি মানুষেরই বিকল্প বা symbol।"[২২]

শারদোৎসব-এ প্রকৃতি ও মানুষের ভারসাম্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাটকের কথাংশ ও সংগীতাংশের মধ্যেও একটা ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ফাল্গুনীতে মানুষের দোসর যেমন প্রকৃতি ঠিক তেমনই কথার দোসর হয়ে উঠেছে সংগীত—

"রাজা। চিত্রপট-

কবি। চিত্রপটে প্রয়োজন নেই- আমার দরকর চিত্তপট-সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।

রাজা। এ-নাটকে গান আছে নাকি।

কবি। হাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।"[২৩]

দুই

শারদোৎসবের সমগোত্রীয় রচনা ফাল্গুনী। শারদোৎসবের চেয়েও এ নাটকে সংগীতের প্রাধান্য বেশি। জনপ্রিয় এইসব সংগীতগুলিই এ নাটকের প্রাণ। নাটকে ভাব-প্রতীতিজাত চিত্রকল্পে আদ্যিকালের বুড়োর অর্থাৎ শীতের জড়তা ও জরার ছবি ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের নাটকে দৃশ্যচিত্রকল্পের গুরুত্ব বেশি ছিল। কিন্তু ফাল্গুনীতে কথা ও সংগীতের আশ্রয়ে দৃশ্যচিত্রকল্প ও শ্রুতিচিত্রকল্প সমান গুরুত্ব পেয়েছে। সংগীতের চিত্রধর্ম এবং সুরধর্ম মিলেমিশে ফাল্গুনী নাটকের সৃষ্টি হয়েছে। এ নাটকে নির্মিত হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির আত্মীয়তার সম্বন্ধ। মানববিশ্বে মহাকালের অমোঘ পদক্ষেপ কীভাবে বাল্য-

কৈশোর-যৌবন-জরার বৃত্ত রচনা করে তারই ইঙ্গিত আছে এ নাটকে। ফাল্গুনীর মূল কথা হলো চলা। এটাই এ নাটকের কেন্দ্রীয় ভাবনা। এই চলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জীবনের গতিধর্ম। জরাকে পরাস্ত করে জীবন ও যৌবনের জয় ঘোষণার মধ্যেই রয়ে গেছে গতির সৌন্দর্য। সেই গতি বা চলার সৌন্দর্যের ছবি ধরা আছে বিভিন্ন চিত্রকল্পে।

যৌবনের দলের একজনের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়েছে—

"... ফুল যাচ্ছে, পাতা যাচ্ছে, নদীর জল যাচ্ছে-তার পিছন পিছন আমিও যাব।"[২৪]

এখানে গতির আবেগে ব্যক্তি ও ব্যষ্টিমানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিরকালীন প্রকৃতিজগত।

অন্য আর একজনের কণ্ঠে শোনা যায়—

"... দেশটা শুদ্ধ চলে, তার পথগুলো চলে।"[২৫]

'দেশ' নামক একটা বিমূর্তধারণা এভাবেই তার অবয়ব খুঁজে পায়। 'পথগুলো চলে'-চলা বা গতির কেন্দ্রীয় ভাবনার অনুষঙ্গেই নাটকে পথের চিত্রকল্পগুলি গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে।

মাঝির কণ্ঠে তাই শোনা যায়—

"ভাই, আমার ব্যাবসা হচ্ছে পথ ঠিক করা—কাদের পথ, কিসের পথ, সে আমার জানবার দরকার হয় না।..."[২৬]

এখানে 'ব্যাবসা' শব্দটির প্রয়োগ প্রচলিত লেনদেনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। পথ এখানে সামনের দিকে ছুটে চলার এবং অনির্দেশের অভিমুখী।

যৌবনের দলের একজনের কণ্ঠ—

"পা দুটো লক্ষ্মীছাড়া, পথে পথেই ঘুরে মরল।"[২৭]

যৌবনের দলের আর একজনের কণ্ঠ—

"পথ চললেই ভয় থাকে না।"[২৮]

কবিশেখরের কণ্ঠ—

"আমাদের বৈরাগীর সর্দার যিনি, তিনি এই সংসারের পথ দিয়ে নেচে চলেছেন।"[২৯]

এভাবে অনেকের বক্তব্যে পথের চিত্রকল্প গতির স্রোতস্বিনী রূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে বাউলের কথায় পথ অন্য মাত্রা পেয়ে যায়—

"আমি গান গাইতে গাইতে যাই, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এসো। গান না গাইলে আমি রাস্তা পাই নে।"[৩০]

ফাল্গুনী নাটকের মূলমন্ত্র বা অভিপ্রায় পথের চিত্রকল্পে প্রধান হয়ে উঠেছে এ কথা বলাই যায়।

এ নাটকে জরা ও যৌবনকে বিভিন্ন চিত্রকল্পে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—

"চন্দ্রহাস : দাদার তুলট কাগজের হলদে পাতাগুলো পিয়াল বনের সবুজ পাতার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি;"[৩১]

জরা ও যৌবনকে পাতার চিত্রকল্পে সুনিপুণভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে। এই রূপ দিতে গিয়ে রঙের বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে—'হলদে' এবং 'সবুজ'। 'হলদে পাতা' ঝরে পড়ার জন্য উন্মুখ। আবার 'সবুজ পাতা' ডানা গজানোর স্বপ্নে বিভোর। জরা ও যৌবনের দ্বন্দ্বকে এভাবে চমৎকার ভাষিক রূপ প্রদান করা হয়েছে। জরা ও যৌবনের আরও ছবি ধরা আছে যুবকের দলের বা বাউল চরিত্রের কণ্ঠস্বরে—

১. "তুলট কাগজগুলো গেছে আপদ গেছে, কিন্তু দাদার সাদা চাদরটা তো কেড়ে নিতে হচ্ছে।"[৩২]

২. "শুকনো পাতায় আকাশ ছেয়ে দিয়ে গেছে।"[৩৩]

৩. "... চেয়ে দেখলেই দেখা যায় শুধু ধুলো আর শুকনো পাতা।"[৩৪]

৪. "আমরা রাত্রিবেলাকার পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকব।"[৩৫]

৫. "...আমাদের চার দিকে কুয়াশার মতো ঘন হয়ে জমবে।"[৩৬]

৬. "আমরা সব বয়সের গুটি-কাটা প্রজাপতি।"[৩৭]

৭. "যারা মরে অমর, বসন্তের কচিপাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে।"[৩৮]

'তুলট কাগজ', 'সাদা চাদর', 'শুকনো পাতা', 'ধুলো', 'পাথর', 'কুয়াশা' ইত্যাদি চিত্রকল্পের মাধ্যমে জরার দিকটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার 'গুটি-কাটা প্রজাপতি' কিংবা 'বসন্তের কচিপাতা' চিত্রকল্পের মাধ্যমে যৌবনের দিকটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হলুদ নয়, সবুজ রঙ ফাল্গুনীতে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। যৌবনের জয়গান এ নাটকের উপজীব্য। অনেক চলা, অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে যৌবনের জয় সুনিশ্চিত হয়ে থাকে। তাই জরার হলুদ রঙ নয় যৌবনের সবুজ রঙের চিত্রকল্প নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে—

> "চলার মধ্যে যদি কেবলই তেজ থাকত তাহলে যৌবন শুকিয়ে যেত। তার মধ্যে কান্না আছে তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।"[৩৯]

নাটকে ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অন্ধকারের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে—

> "ওখানে যে কালো খাঁড়ার মতো অন্ধকার।"[৪০]

অন্ধকারের বিপরীতে সন্নিবেশিত হয়েছে আলোর চিত্রকল্প। চন্দ্রহাসের হাসির প্রসঙ্গে যুবকদলের একজনের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়েছে অসামান্য আলোর চিত্রকল্প—

> "যেন সূর্যের আলো, কুয়াশার তাড়কা রাক্ষসীকে তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটে।"[৪১]

নদীর চিত্রকল্পে নদীর গতিপ্রবাহ মানবজীবনের সঙ্গে অন্বিত। ফাল্গুনীর কেন্দ্রীয় ভাবনা অনন্ত চলার সংগীত যেন রূপ পরিগ্রহ করেছে নদীর চিত্রকল্পে—

১. "ঝাউগাছের বীথিকার ভিতর দিয়ে কোথা থেকে এই একটা নদীর স্রোত চলে আসছে, এ যেন কোন দুপুররাতের চোখের জল।"[৪২]

২. "... গুহার ভিতর থেকে নদীর জল বেরিয়ে আসছে..."[৪৩]

কালনিরপেক্ষ নদীপ্রবাহের না আছে শুরু না আছে শেষ। নদী চিত্রকল্পের মাধ্যমে মানবজীবনের বেদনাকে গতির মন্ত্রবলে রূপায়িত করা হয়েছে।

"ওগো নদী, আপন বেগে

পাগল-পারা,"[৪৪]

কিংবা,

"ওগো নদী, চলার বেগে

পাগল-পারা,"[৪৫]

নদীর চঞ্চল গতির মরমী সংবেদ নাটকের কেন্দ্রীয় প্রবাহকে মূর্তিমান করে তুলেছে।

নদীর চিত্রকল্পের পাশাপাশি সমুদ্রের চিত্রকল্পও ফাল্গুনী নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। মনমরা রাজার হৃদয়কে সঞ্জীবিত করতে গতির আনন্দধারা ঢেলে দিতে গিয়ে কবিশেখরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এই গান—

"পূর্ণিমাতে সাগর হতে

ছুটে এল বান,

আমার লাগল প্রাণে টান।

আপন মনে মেলে আঁখি

আর কেন বা পড়ে থাকি

কিসের ভাবনায়

আমার ঘরে থাকাই দায়।”[৪৬]

নাটকের শেষে সম্মিলিত উৎসবের গানেও সমুদ্রের চিত্রকল্পে অনন্তের ইশারা ও যৌবনের পূর্ণতার ইঙ্গিত—

“অকূল প্রাণের সাগর-তীরে

ভয় কী রে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে।

যা আছে রে সব নিয়ে তোর

ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে

আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।”[৪৭]

যে ক’টি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ফাল্গুনী নাটকে রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি চরিত্র হলো বাউলের চরিত্র। এই বাউল চরিত্রকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু চিত্রকল্পের সন্নিবেশ নাটকের মূলভাবকে ত্বরান্বিত করেছে। যুবকের দলের চোখে সে এক বিস্ময়—

১. “যেন কালবৈশাখীর প্রথম মেঘ।”[৪৮]

২. “...ওর আঙুলের আগায় চোখ ছড়িয়ে আছে।”[৪৯]

৩. “ওকে দেখলেই বুঝতে পারি কে আসছে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ করে।”[৫০]

৪. “... যেন ওর মধ্যে সকাল হয়েছে।”[৫১]

৫. "যেন ওর ভুরুর মাঝখানে অরুণের আলো খেয়া-নৌকোটির মতো এসে ঠেকেছে।"[৫২]

৬. "ওর মনটা ভোরবেলাকার আকাশের মতো চুপ।"[৫৩]

৭. "এখনই যেন পাখির গানের ঝড় উঠবে—তার আগে সমস্ত থমথমে।"[৫৪]

৮. "ঐ-যে একটু একটু একতারাতে ঝংকার দিচ্ছে,..."[৫৫]

বাউল সত্যদ্রষ্টা। তাই সে 'আসছে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ করে'। জড়তার এই অন্ধকার, অজ্ঞানতার এই অন্ধকার ভেদ করেই আলোর সত্যপথ খুঁজে নিতে হয়। বাউল নির্ভীক। তাই তাকে বলতে শোনা যায়—

"... একদিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম ভয় হল দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখওয়ালার দৃষ্টির অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টি উদয় হল। সূর্য, যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো।..."[৫৬]

প্রকৃতিজগৎ এই নাটকে অজস্র চিত্রকল্পের যোগান দিয়েছে। সেগুলিকে প্রাকৃতিক চিত্রকল্প অভিধায় অভিহিত করা যেতে পারে। কবিশেখর যিনি "অধ্রুব মন্ত্রের বৈরাগী"[৫৭] তিনি যৌবনের বৈরাগীর মর্ম এবং পরিচয় অনুধাবন করানোর জন্য রাজাকে বলেছেন—

"পাহাড়ের গুহা ছেড়ে যে-নদী বেরিয়ে পড়েছে তার বৈরাগ্য কি দেখেন নি মহারাজ। সে অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে দিতেই আপনাকে পায়। নদীর পক্ষে ধ্রুব হচ্ছে বালির মরুভূমি—তার মধ্যে সেধলেই বেচারা গেল।..."[৫৮]

চন্দ্রহাসের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির অংশ হওয়ার চেতনা ও বাসনা দুটোই বিদ্যমান। তাই বসন্তের আনন্দে অংশীদার না হতে পারা দাদা সম্পর্কে তাঁর উক্তিতে আকুতি ও হতাশা ধরা পড়েছে—

"... আজ পৃথিবীর ধুলোমাটি পর্যন্ত শিউরে উঠেছে আর এ পর্যন্ত দাদার গায়ে বসন্তের আমেজ লাগল না।"[৫৯]

আদ্যিকালের বুড়োর অর্থাৎ জরাবৃদ্ধের পরিচয় কলুর সংলাপে—

"কালো, ... একেবারে রাত্রের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। আর বুকে দুটো চক্ষু জোনাক-পোকার মতো জ্বলছে।"[৬০]

পরিচিত এইসব প্রাকৃতিক চিত্রকল্প নাটকের কথা-অংশে যেমন আছে তেমনই সংগীত-অংশেও আছে। সংখ্যার নিরিখে সংগীত-অংশে প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের পরিমাণ অধিক এবং প্রত্যাবৃত্ত।

তথ্যসূত্র :

১. কনক বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক, এস ব্যানার্জি এন্ড কোং, প্রথম সংস্করণ ২৫ শে বৈশাখ ১৩৭২, পৃ. ১১৬

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৮০১

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৭, পৃ. ৬০৭

৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬০৮-৬০৯

৫. কনক বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক, এস ব্যানার্জি এন্ড কোং, প্রথম সংস্করণ ২৫ শে বৈশাখ ১৩৭২, পৃ. ১২৮-১২৯

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৭৯৪

৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৯৫

৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৯৬-৭৯৭

৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৯৮

১০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮০০

১১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৯৮

১২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮০০

১৩.প্রাগুক্ত : পৃ. ৮০৪

১৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৪

১৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮০৫

১৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮০৫

১৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮০৭

১৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮০৭

১৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮০১

২০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮৩১-৮৩২

২১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮১৪

২২. প্রমনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, প্রথম খণ্ড, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, তৃতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, পৃ. ১৪৮-১৪৯

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৮০১

২৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৬

২৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২০

২৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮১৩

২৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮১৯

২৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৮

২৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৯৮

৩০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২১

৩১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮০৫

৩২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮০৫

৩৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮১৭

৩৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮১৯

৩৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮১৯

৩৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮১৯

৩৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮১৪

৩৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৭

৩৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৪

৪০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৮

৪১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২০

৪২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৪

৪৩. প্রাগুক্ত : পৃ : ৮২৮

৪৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮০৪

৪৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮০৪

৪৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৯৮

৪৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮৩৩

৪৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৯

৪৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৯

৫০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৯

৫১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৯

৫২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৯

৫৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৯

৫৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৯

৫৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২৯

৫৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২১

৫৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৯৭

৫৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৯৭

৫৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮০৫

৬০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮১৬